শেখ সাদীর গল্প

আমীরুল ইসলাম

চিরায়ত গ্রন্থমালা

শেখ সাদীর গল্প

আমীরুল ইসলাম

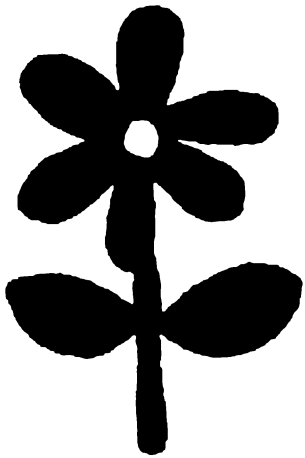

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১১১

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
ফাল্গুন ১৪০০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

পঞ্চম সংস্করণ দশম মুদ্রণ
কার্তিক ১৪১৯ অক্টোবর ২০১২

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
পঁচাত্তর টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0110-2

উৎসর্গ

হাবীব আহসান

শ্রদ্ধাস্পদেষু

অমর কবি শেখ সাদী।

ফার্সিভাষায় কাব্য রচনা করে তিনি পৃথিবীবিখ্যাত। তাঁর লেখা *গুলিস্তাঁ* ও *বুস্তাঁ* বিশ্বসাহিত্যে উজ্জ্বল স্থান অধিকার করে আছে। *গুলিস্তাঁ* ও *বুস্তাঁ* অর্থ—ফুলের বাগান ও সৌরভের উদ্যান। বইদুটিতে রয়েছে মনোরম ছন্দে বাঁধা কতগুলো ছোট ছোট গল্প। এই গল্পগুলোর অধিকাংশই উপদেশমূলক। গল্পচ্ছলে উপদেশ কিংবা উপদেশচ্ছলে গল্প বলাই ছিল হয়তো সাদীর উদ্দেশ্য। কিন্তু এগুলো কাব্য হিসেবে অতুলনীয় হয়ে উঠেছে, গল্প হিসেবে তো বটেই। ফার্সিভাষায় লেখা এই সমস্ত কবিতা শত শত বছর ধরে পাঠকদের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় শেখ সাদীর রচনা অনূদিত হয়েছে।

শেখ সাদী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইরান দেশে। ধনে-মানে, শিক্ষা-জ্ঞানে, গৌরবে-ঐতিহ্যে একসময় ইরান ছিল খুব উন্নত দেশ। ইরানের তদানীন্তন রাজধানী সিরাজী নগরে ১১৯৪ সালে সাদীর জন্ম। সাদীর বাবা ছিলেন সম্ভ্রান্ত রাজকর্মচারী। শৈশবেই সাদীর বাবা-মা মারা যান। এতে পারিবারিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। সাদী অবশ্য ছিলেন সকল কিছুর ঊর্ধ্বে। জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি ত্যাগ করেছিলেন ভোগবিলাস। জগতের ঐশ্বর্য, রাজার অনুগ্রহ ও সম্মান, পার্থিব সুখ, যশ ও অর্থকে তুচ্ছ করে প্রকৃত দরবেশের মতো তিনি জীবনযাপন করেছেন। জীবনের শেষদিনগুলো কাটিয়েছেন সামান্য পর্ণকুটিরে, সাধনাকেন্দ্রে—একা, নিঃসম্বল অবস্থায়।

তিনি নির্জনে বসে কাব্যচর্চা করতেন। আর জ্ঞান-সাধনার জন্য তীর্থযাত্রা করতেন। তিনি পায়ে হেঁটে ১৫ বার মক্কা গিয়েছিলেন। এছাড়া আরব পেরিয়ে আবিসিনিয়া পর্যন্ত আর এধারে ভারতবর্ষ পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁকে টাকা দেবার লোকের অভাব ছিল না, কিন্তু তিনি কোনোদিনই নিজের জন্য টাকা নেননি। ভক্তদের দেয়া খাদ্য ও সামান্য অর্থসাহায্যেই তাঁর দিন চলে যেত।

সাদী ছিলেন মহাপণ্ডিত। দেশভ্রমণের ফলে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয় তাঁর। তাঁর ছিল অসামান্য পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা, জীবনদৃষ্টি এবং মানবপ্রেম। জীবন-অভিজ্ঞতাকেই তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন কবিতা-আকারে। শেখ সাদী পদ্যে লেখা গল্পগুলোর মধ্যে দিয়ে যে উপদেশ দিয়েছেন—তা সকলের কাছেই মূল্যবান। এর মাধ্যমে তিনি মানুষের প্রতি মানুষের চিরন্তন ভালোবাসার কথাই বলেছেন। ন্যায়নীতি ও মূল্যবোধের মাধ্যমে মানুষ গড়ে তুলবে সুন্দর জীবন—এই ছিল সাদীর কাম্য।

গুলিস্তাঁ ও *বুস্তাঁ*—অসংখ্য গল্প থেকে মাত্র কয়েকটি নিয়ে এই বইটি সাজানো হয়েছে। মূল কবিতার স্বাদ এই লেখাগুলোতে কিছুই পাওয়া যাবে না। ফার্সি কাব্যভুবনের সুরেলা ছন্দ, ধ্বনিমাধুর্য ও উপদেশবাণীর ঝংকার এই বইতে নেই। তোমরা বড় হয়ে শেখ সাদীর মূল লেখা পড়বে। তাঁর বিচিত্র জীবনকাহিনী পড়ে দেখবে। সেখানেও অনেককিছু শেখার আছে। এই টুকরো টুকরো গল্পগুলো তোমাদের ভালো লাগবে আশা করি। শেখ সাদীর রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তোমাদের কাছে তুলে ধরাই এই বইয়ের উদ্দেশ্য।

আমীরুল ইসলাম
৫৫ গোলারটেক, মীরপুর, ঢাকা।

উপকারী মিথ্যা

বাদশাহ আদেশ দিলেন, অপরাধীর প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত। লোকটিকে শূলে চড়াও।

বাদশাহ'র আদেশ অমান্য করে কে! লোকটিকে ধরে-বেঁধে নিয়ে আসা হল শূলে চড়ানোর জন্যে।

লোকটা কাতর অনুনয়-বিনয় করল। কিন্তু বাদশাহ অনড়। লোকটা বুঝল, বাঁচবার তার কোনো আশা নেই। তখন সে বাদশাহ'র উদ্দেশে গালাগালি শুরু করল। হাত-পা ছুড়ে চিৎকার করতে লাগল।

বাদশাহ বসে আছেন বেশ দূরে। লোকটির চিৎকার-চেঁচামেচির কোনো অর্থ তিনি বুঝতে পারলেন না। পাশে-বসা একজন সভাসদকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লোকটি কী বলতে চায়?

সভাসদ দেখলেন ভারি বিপদ! সত্য বললে বাদশাহ হয়তো ভয়ানক রেগে যাবেন। তাই তিনি বললেন—বাদশাহ লোকটি বলছে : যে ব্যক্তি অপরাধীকে

ক্ষমা করে সে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করে। আমিও তো সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করতে চাই।

বাদশাহ লোকটির কথা শুনে খুব খুশি হলেন। বললেন, ওকে মুক্ত করে দাও।

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন আরেক সভাসদ।

প্রথম সভাসদের ওপর তার ছিল ভারি রাগ। সে তাড়াতাড়ি বলল—বাদশাহ, ঐ সভাসদ মিথ্যাকথা বলছে। লোকটা আপনাকে গালাগালি দিচ্ছে। একে মুক্ত করা উচিত নয়।

এই সভাসদের কথা শুনে বাদশাহ বেশ উত্তেজিত হলেন। রাগ করলেন তিনি। সভাসদের দিকে তাকিয়ে বললেন—ওর মিথ্যাকথা অনেকগুণে ভালো। কারণ ও মিথ্যা বলছে একটা লোকের প্রাণরক্ষার জন্যে আর তুমি সত্য কথা বলছ দুটো লোকের ক্ষতি করার জন্যে। তাহলে আমি কার কথা শুনব? ক্ষতিকর সত্যের চেয়ে উপকারী মিথ্যা আমার কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য।

বাদশাহ'র কথা শুনে সভাসদরা ধন্য ধন্য করতে লাগল।

নুনের দাম

ইরান এক সুন্দর দেশ।

সেই দেশের এক সম্রাট—নাম তাঁর নওশের। প্রজাদের তিনি ভালোবাসেন। সত্য ও সুন্দরের কথা বলেন। ন্যায়ভাবে শাসন করেন রাজ্য। চারদিকে তাঁর সুনাম। সকলেই সম্রাট নওশেরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

সম্রাট একদিন সদলবলে শিকারে গিয়েছেন। বনের এদিকে ঘুরে বেড়ান, ওদিকে ঘুরে বেড়ান। চারদিকে চমৎকার এক আনন্দ-উৎসব। দুপুরবেলা, ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে নওশের বিশ্রাম নিতে বসলেন।

এখন খাওয়াদাওয়ার সময়।

সম্রাট নওশের ক্ষুধার্ত। তাঁর সঙ্গীদেরও সেই অবস্থা। খেতে বসে দেখা গেল, খাবারদাবার সব ঠিক আছে, কিন্তু লবণ আনা হয়নি ভুলে।

একজন সিপাই সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল লবণের সন্ধানে। সম্রাট তাকে বললেন—কোথায় যাচ্ছ তুমি?

—বনের ধারে কোনো বাড়িতে যাব। দেখি সেখানে লবণ পাওয়া যায় কিনা।

—যেখানেই যাও-না কেন, যার কাছ থেকেই লবণ আনো-না কেন, পয়সা দিয়ে কিনে এনো কিন্তু।

সিপাই ঘোড়া নিয়ে ছুটল। খুব তাড়াতাড়ি লবণ জোগাড় করে ফেলল সে।

ফিরে এল আরো দ্রুত। মুখে তার সার্থকতার হাসি। সম্রাট তখনও খাওয়া শুরু করেননি।

সিপাই বলল—বাদশাহ নামদার, লবণ সংগ্রহ করে এনেছি।

সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন—পয়সা দিয়ে কিনে এনেছ তো? যার কাছ থেকে লবণ এনেছ তাকে পয়সা দিয়েছ তো? এমনি এমনি চেয়ে নিয়ে আসোনি তো লবণ?

নওশের ব্যাকুল হয়ে তা জানতে চাইলেন। এই দেখে এক উজির আজম মৃদু হেসে বললেন—সম্রাট, আপনি এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? বারবার আপনি জানতে চাইছেন—পয়সা দিয়ে কিনে আনা হয়েছে কিনা। কারো কাছ থেকে যদি একটু লবণ এমনি এমনি নিয়েই আসা হয় তাতে ক্ষতি কী?

সম্রাট বললেন—না, না, সেটা হওয়া উচিত নয়। আমি যদি অন্যায়ভাবে কারো গাছ থেকে একটা আপেল নিই তবে দেখা যাবে আমার সঙ্গীরা গাছটাই উপড়ে দিয়েছে। আমি যদি সিপাইকে বলি, যাও বিনামূল্যে একটা ডিম নিয়ে এসো—ও গিয়ে তাহলে কারো বাড়ি থেকে মুরগিসুদ্ধ ধরে আনবে। এটা কি ঠিক হবে?

সকলেই মাথা ঝাঁকালেন।

—না, এটা করা ঠিক হবে না।

বাদশাহ নওশের বললেন—সম্রাট হয়ে অন্যায় করা উচিত নয়। বাদশাহ যদি একটু অন্যায় করে তবে রাজকর্মচারীরা অন্যায় করবে আরো বেশি। তাই ক্ষমতাবান সম্রাটকে থাকতে হবে আরো সচেতন। আমি শুধু সেটুকুই চেষ্টা করি।

দরবারের সকলেই সম্রাটের প্রশংসায় শতমুখ হয়ে উঠল।

আমাদের মহান সম্রাটের জয় হোক।

ক্ষমা

বিখ্যাত সম্রাট হারুন-অর-রশিদ। আরবভূমিতে তাঁর নাম ছড়িয়ে আছে একজন সুশাসক ও প্রজাবৎসল সম্রাট হিসেবে। তিনি গরিবের উপকার করতেন। দুঃখী ও বিপদগ্রস্ত মানুষদের সহায়তা করতেন। সবচেয়ে বড় কথা তিনি ছিলেন ভালো মানুষদের পক্ষে। মন্দ মানুষদের বিপক্ষে।

একদিন।

সম্রাট হারুন-অর-রশিদ বসে আছেন সভাকক্ষে। মন্ত্রীদের সঙ্গে গভীর এক বিষয় নিয়ে শলাপরামর্শ করছেন। কী করে প্রজাদের উপকার করা যায়—এই ছিল তাঁর সারাক্ষণ কর্ম ও ধ্যান।

এমন সময় একটি লোক প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করল। প্রহরীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে সোজা প্রবেশ করল সভাকক্ষে। সম্রাটের সামনে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে লাগল লোকটি। সম্রাট বললেন—কী হয়েছে তোমার?

—বাদশাহ নামদার, একজন আপনাকে ও আপনার মাকে নিয়ে যা-তা গালাগালি করছে রাস্তায়। এ আমি সহ্য করতে পরলাম না। তাই ছুটে এলাম। এই লোকের এখনই বিচার হওয়া উচিত।

সম্রাট মন দিয়ে সবটুকু শুনলেন। মন্ত্রীদের দিকে তাকিয়ে বললেন—লোকটিকে কী করা উচিত বলে আপনারা মনে করেন?

মন্ত্রীরা সকলেই ভয়ানক উত্তেজিত। এতবড় দুঃসাহস লোকটির! ওকে ধরে এনে এক্ষুনি ফাঁসিতে চড়াও। একজন সম্রাটকে বললেন—লোকটিকে ধরে এনে সমুচিত সাজা দেয়া উচিত। ওকে শূলে চড়ানো প্রয়োজন।

আরেকজন বললেন—ওকে হত্যা করে ওর মাংস কুকুর-বেড়ালকে দিয়ে খাওয়ানো দরকার।

—ওর জিভ কেটে, চুল ছেঁটে ওকে শহর থেকে বের করে দেয়া উচিত।

কেউ-বা বলল—বেয়াদবটাকে মাটিতে পুঁতে পাথর ছুড়ে ছুড়ে হত্যা করতে হবে।

সম্রাট হারুন-অর-রশিদ সকলের বক্তব্যই শুনলেন। তারপর নীরবে একটু হাসলেন।

মৃদু হাসি দিয়ে সকলের উদ্দেশে বললেন—না হে, লোকটিকে ক্ষমা করে দেয়াই উচিত আমাদের। নইলে প্রমাণ হয় না আমরা ঐ লোকটির চেয়ে বড়। লোকটি আমাকে গালাগালি দিয়েছে। ও নীচুমনের পরিচয় দিয়েছে। আমি যদি ওকে গালি দিতে চাই তবে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায়? আমিও তো তবে ওর মতো হয়ে যাই। ওকে ক্ষমা করে দাও। ক্ষমাই মহত্ত্বের লক্ষণ।

বিচার নেই

বাদশাহ'র কঠিন অসুখ। সারাদিন তিনি বিছানায় শুয়ে থাকেন। শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হচ্ছে। মনে কোনো সুখ নেই। কাজকর্ম করতে পারেন না।

বেঁচে থাকার আর কোনো আশা নেই তাঁর। বাদশাহ বুঝলেন, মৃত্যু তাঁর দুয়ারে এসে হানা দিয়েছে। দূরদূরান্ত থেকে চিকিৎসকরা এল। নানারকমের ওষুধ দিল। কিন্তু কিছুতেই কোনো উপকার হয় না।

সকলেই খুব চিন্তিত।

চিকিৎসক এলেন ইরান-তুরান থেকে। চিকিৎসক এলেন কাবুল-কান্দাহার থেকে। শেষে এক চিকিৎসক এলেন গ্রিস থেকে।

গ্রিসের চিকিৎসক বেশ কয়েকদিন ধরে সবধরনের পরীক্ষা করলেন বাদশাহকে। নাড়ি টিপে দেখলেন। শরীরের তাপ নিলেন। তারপর তিনি বললেন, এ বড় কঠিন অসুখ। তবে এর চিকিৎসা আছে। একজন অল্পবয়স্ক বালক প্রয়োজন, যার হৃৎপিণ্ড থেকে ওষুধ তৈরি করতে হবে। সেই ওষুধে বাদশাহ সুস্থ হয়ে উঠবেন।

বাদশাহ'র অসুখ। প্রয়োজন অল্পবয়স্ক বালক। দিকে দিকে লোক ছড়িয়ে পড়ল। খুঁজতে খুঁজতে একটা ছেলেকে পাওয়াও গেল। ছেলের বাবা টাকার বিনিময়ে খুব অনায়াসে ছেলেটিকে বিক্রি করে দিল বাদশাহ'র লোকদের কাছে। টাকাও পেল বিপুল পরিমাণ।

আর কাজি বিচারসভায় রায় দিলেন, এই ছেলের জীবন বধ করা অন্যায় কোনো কাজ নয়। কারণ এই ছেলের তুচ্ছ জীবনের বিনিময়ে বাদশাহ'র মূল্যবান জীবন রক্ষা পাবে।

ছেলেটি এইসব ঘটনা দেখে সারাক্ষণ মিটিমিটি হাসে। জল্লাদ তাকে হত্যা করার জন্যে ধরে-বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে বধ্যভূমিতে। তার হৃৎপিণ্ড থেকে তৈরি হবে ওষুধ। ছেলেটি তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে হো হো করে হাসতে লাগল।

বাদশাহ পেছনে ছিলেন। ছেলেটির হাসির শব্দ শুনে তিনি খুব বিচলিত হলেন। একটু পরেই তার মৃত্যু হবে! মাটিতে লুটিয়ে পড়বে তার সুন্দর দেহ। তবে ছেলেটি প্রাণ খুলে হাসে কেন? বাদশাহ তাকে ডেকে পাঠালেন।

—তুমি মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে এরকম ভাবে হাসছ কেন?

ছেলেটি হাসতে হাসতেই বলল—হায়, আমার জীবন! আমি হাসব-না তো কে হাসবে বলুন? পিতামাতার দায়িত্ব সন্তানদের রক্ষা করা। কিন্তু দেখুন, কিছু অর্থের বিনিময়ে আমার বাবা আমাকে বিক্রি করে দিয়েছেন। কাজির দরবারে মানুষ যায় কেন? সুবিচারের আশা নিয়ে। কিন্তু কাজি সাহেব অন্যায়ভাবে বাদশাহ'র পক্ষ নিলেন। আমাকে হত্যা করার হুকুম দিলেন তিনি। আর বাদশাহ'র কর্তব্য কী? বাদশাহ তো গরিব-দুঃখী, অত্যাচারিত, নিপীড়িত প্রজাদের রক্ষা করবেন। কিন্তু এখন কী ঘটতে যাচ্ছে আমার জীবনে? বাদশাহ নিজের জীবন রক্ষা করার জন্য অন্যের জীবনকে তুচ্ছ করছেন। কিন্তু অপরের জীবনও যে তার নিজের কাছে অতি মূল্যবান—এই সামান্য কথা তিনি মনেই রাখলেন না। হায়! একটু পরেই আমার মৃত্যু হবে। আমি হাসব-না তো কে হাসবে! জগৎ-সংসারের এইসব খেলা দেখে একমাত্র আমিই এখন প্রাণ খুলে হাসতে পারি।

বাদশাহ এই কথা শুনে অবাক হলেন। ছেলেটির প্রতি অসীম মমতায় তিনি কাতর হয়ে উঠলেন। তিনি ছেলেটিকে মুক্ত করে দিলেন।

আর আশ্চর্যের ব্যাপার—

তার কিছুদিন পরেই বাদশাহ'র অসুখ সেরে গেল। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন।

কাজের ফল

আবদুল একজন কাঠের ব্যবসায়ী।

সে ছিল খুব অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর এক লোক। জোর করে সে অন্যের গাছ কেটে ফেলত। কাঠ কেটে নিয়ে আসত আর বিক্রির সময় দাম হাঁকাত অনেক বেশি।

কেউ কেউ বলত : আবদুল, মানুষের মনে কষ্ট দিয়ে এভাবে ব্যবসা কোরো না। গুরুজনেরা উপদেশ দিত, নিন্দুকেরা নিন্দা করত। কিন্তু আবদুল কোনোকিছু গ্রাহ্যই করত না।

একদিন।

একজন তাকে বলল : আবদুল, গরিবদের ওপরে অত্যাচার কোরো না। গরিবদের চোখের অশ্রুতে যে অভিশাপ একদিন তার শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে।

আবদুল নির্বিকার।

এসব কথা তার কানেই ঢোকে না। বরং সে বিরক্ত হয়। একদিন ঘটলও এক দুর্ঘটনা। আবদুলের কাঠের দোকানে আগুন লাগল। দাউ দাউ করে আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়ল নীল আকাশে। আবদুলের সমস্ত কাঠ পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

কিন্তু আবদুলের এই দুঃখে কেউ সমব্যথী হল না। কেউ এসে তার পাশে দাঁড়াল না।

আবদুল বুক চাপড়ে হায় হায় করতে লাগল।

হায় হায়, আমার কী হল!

আজ সেই লোকটি আবদুলের কাছে এসে বলল : আবদুল, মনে রেখো তুমি এতদিন অত্যাচারের আগুন জ্বালিয়েছিলে লোকের মনে, সেই আগুনেই সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। অত্যাচারী ব্যক্তি কখনও সুখী হতে পারে না। তাকে একদিন শাস্তি ভোগ করতেই হয়।

চোরে না-শোনে ধর্মের কাহিনী

পাহাড়ি রুক্ষ ধু-ধু প্রান্তর। ছোট-বড় পাহাড়। এরই মধ্যে রাস্তা। একদল বণিক চলেছে নিজেদের গন্তব্যে। কিন্তু তারা পথিমধ্যে আক্রান্ত হল ভয়ংকর দস্যুদের কবলে। দস্যুরা প্রথমেই 'হারে রে রে হারে রে রে' বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল বণিকদলটির ওপর। তারপরে শুরু করল নির্মমভাবে মারধোর। মালপত্র যা ছিল সব লুঠ করে নিল নিমেষের মধ্যে।

বণিকেরা অসহায়। তারা করুণভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল। তারা বলতে লাগল : তোমরা সব লুঠ করে নিলে আমরা এই পাহাড়ি পথে না-খেয়ে মারা পড়ব। আমাদের এতবড় বিপদে তোমরা ফেলো না।

কিন্তু দস্যুরা বড় ভয়ংকর। তারা খুব নির্মম ও নিষ্ঠুর। কোনো কথাই তাদের কানে প্রবেশ করছে না।

বণিকদলের মধ্যে ছিলেন একজন জ্ঞানীব্যক্তি। তাঁর নাম লোকমান হাকিম। বণিকরা তখন জ্ঞানীব্যক্তিকে বারবার অনুরোধ করতে লাগল—আপনি দস্যুদের উদ্দেশে কিছু বলুন। উপদেশবাণী দিন। যদি এতে দস্যুদের মনে কোনো দয়ার উদ্রেক হয়। তারা যদি এতে শান্ত হয়। এই জঘন্য পাপকাজ থেকে তাদের মুক্ত হওয়া উচিত।

জ্ঞানীব্যক্তিটি তখন হেসে ফেললেন।

—নাহে, যারা পশুর মতো আচরণ করে তাদের উপদেশ দিয়ে কোনো লাভ নেই। তারা যুক্তি বিবেচনা করে না। তাদের সঙ্গে কথা বলা আর মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে চিৎকার করা একই ব্যাপার।

যে লোহায় মরচে পড়ে গেছে—সেটা হাজারবার ঘষলেও উজ্জ্বল হবে না কখনো। যাদের হৃদয়ে মরচে পড়েছে তাদের সঙ্গে কথা বলতে যাওয়াই বোকামি।

যেমন ছিলাম

বাদশাহ'র মন ভালো নেই। বৃদ্ধ বয়স। যে-কোনোদিন তিনি মারা যাবেন। তিনি মারা গেলে কে বাদশাহ হবেন? কারণ তার কোনো সন্তান নেই।

বাদশাহ ঘোষণা করে দিলেন : কাল ভোরবেলা এই রাজধানী শহরে প্রথম যে-ব্যক্তি প্রবেশ করবে তাকেই আমি পুত্র হিসেবে গ্রহণ করব। সেই হবে এই বিশাল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী।

পরদিন ভোরবেলা। সকলে উদগ্রীব। রাজকর্মচারীরা নগরদ্বারে প্রস্তুত। তাদের উৎসুক দৃষ্টি, কে হবে সেই ভাগ্যবান?

এমন সময় দেখা গেল একজন দীনহীন ভিক্ষুক, পরনে তার শতচ্ছিন্ন পোশাক, আপনমনে সে প্রবেশ করছে নগরে। রাজকর্মচারী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ভিক্ষুককে ধরে নিয়ে হাজির হল রাজদরবারে। একেবারে রাজার সামনে।

বাদশাহ তাকেই গ্রহণ করলেন।

ভিক্ষুক হল তার পোষ্যপুত্র। সে হবে রাজ্যের উত্তরাধিকারী।

ভিক্ষুকের আর আনন্দ ধরে না। দুবেলা ভাতের জন্যে তাকে ঘুরে বেড়াতে হত মানুষের দরজায় দরজায়। হঠাৎ করে ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেছে। সে আজ অগাধ ধনসম্পদের মালিক।

সমস্ত রাজ্য তার।

কোষাগারের সমস্ত অর্থ তার।

এই সুখ! এই স্বাচ্ছন্দ্য! ভিক্ষুকের মাথা খারাপ হয়ে উঠল। সে ভোগবিলাসে, আনন্দ-উৎসবে জীবন কাটাতে লাগল।

বাদশাহ একদিন মারা গেলেন।

ভিক্ষুক বসল সিংহাসনে।

সকলেই তাকে বাদশাহ বলে মেনে নিল।

কিন্তু বাদশাহ হওয়ার পরেই রাজ্যজুড়ে দেখা দিল অশান্তি। নতুন বাদশাহ'র কোনো জ্ঞানগম্যি নেই। রাজ্য পরিচালনার মতো বুদ্ধিও তার

নেই। মন্ত্রীরা তাই এই নতুন বাদশাহকে খুব ভালোভাবে মেনে নিতে পারল না। তারা বাদশাহ'র হুকুম পালন করতে অপারগ।

রাজ্যজুড়ে শুরু হল অরাজকতা।

অন্যান্য দেশের বাদশাহরা ভাবলেন, এইতো সুযোগ। দখল করতে হবে রাজ্য।

নতুন বাদশাহ পড়লেন মহাভাবনায়।

দিনরাত তার দুশ্চিন্তা। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, চোখে তার ঘুম নেই।

এমন সময় ভিক্ষুকের এক পুরনো বন্ধু এল তার সঙ্গে দেখা করতে। বন্ধু এখন বাদশাহ হয়েছে। এ আনন্দ তারও। বন্ধুকে সে বলল—তুমি বাদশাহ হয়েছ। এর চেয়ে সুখ জীবনে আর কী হতে পারে! একদিন তুমি এই রাজ্যের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে। আজ পুরো রাজ্যটাই তোমার। তোমার কোনো অভাব নেই। টাকা-পয়সার চিন্তা নেই। তোমার মতো সুখী আর কে আছে ভাই।

নতুন বাদশাহ তখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : বন্ধু, তুমি যদি আমার মনের আসল অবস্থা বুঝতে পারতে তবে হয়তো এই কথা আর বলতে না। যখন পথে পথে ঘুরে বেড়াতাম, একবেলা খেতাম, আরেকবেলা খেতে পেতাম না—সেই জীবনই আমার ভালো ছিল। খাবার চিন্তা আজ হয়তো আমার নেই। কিন্তু প্রতিমুহূর্তে, প্রতিক্ষণে নানা দুশ্চিন্তায় দিন কাটে আমার। রাজ্য চালানো যে কী কঠিন কাজ সে তোমাকে কীভাবে বোঝাই। এই বিত্তের চেয়ে নিঃস্ব জীবনই আমার ভালো। বন্ধু, আমি সেই পুরনো জীবনেই ফিরে যেতে চাই।

সত্যিকার পালোয়ান

একজন পালোয়ান। ইয়া মোটা দশাসই চেহারা তার। বিশাল বপু। যেমন মোটা তেমনই তাগড়া শরীর।

কিন্তু বেচারা খুব মনখারাপ করে বসে আছে রাস্তায়। কেউ একজন তাকে খুব কটু কথা শুনিয়ে গেছে। রীতিমতো অপমান। বলেছে, সে নাকি দেখতে হাতির মতো।

পালোয়ানের মন খারাপ। বিমর্ষ বদনে সে বসে বসে ভাবছে, এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে। সে মোটা, তাতে অন্যের কী আসে যায়!

একজন বুদ্ধিমান লোক যাচ্ছিল সেই পথ দিয়ে। গোমড়ামুখো পালোয়ানকে দেখে সে সামনে এল, 'ও হে পালোয়ান ভাই, কী হয়েছে তোমার? মন-খারাপের কারণ কী?'

পালোয়ান চুপ করে রইল। কী বলবে সে?

'কী হে পালোয়ান ভাই—'

পালোয়ান তখন গালে হাত দিয়ে দুঃখী গলায় বলল, 'ভাইরে, কী আর বলব! একজন আমাকে খুব অপমান করে গেছে। সেই অপমানের জ্বালায় জ্বলে মরছি।'

এই-না শুনে হো হো করে হেসে ফেলল বুদ্ধিমান লোকটি।

'ওহে পালোয়ান ভাই, শুনে খুবই আশ্চর্য হলাম। দশ মণ, বিশ মণ বোঝার ভার তুমি অনায়াসে বইতে পারো—সেই তুমি কিনা সামান্য একটু অপমানের বোঝা বইতে পারছ না।

মনে রেখো পালোয়ান, মানুষ মাটির তৈরি। মাটির মতোই সহনশীল হওয়া উচিত আমাদের। প্রকৃত পালোয়ান কখনও শক্তির বাহাদুরি করে না। সে সকলকে ক্ষমা করে।

কারণ ক্ষমাই মানুষের মহত্তম গুণ।'

ভিক্ষা নয়

এক ছিল দরিদ্র ব্যক্তি।

এক বেলা খায় তো আরেক বেলা খায় না। পরনে তার হাজার তালির পোশাক। ক্ষুধার জ্বালায় কাতর থাকে সারাদিন। ঘর নেই, বাড়ি নেই। পথে ঘোরে, পথেই ঘুমায়।

মনে তার অসীম দুঃখ।

গরিব হলে কী হবে? লোকটির আত্মসম্মানবোধ ছিল তীব্র। খেতে পেত না। কিন্তু কারও কাছে হাত পাতত-না সে। কেউ যদি কিছু দিত তাকে তবেই তার খাওয়া হত। নইলে উপোস।

তার এই গরিবি অবস্থা দেখে একজন বলল—ভাইরে, এত কেন কষ্ট করছ? তার চেয়ে বরং যাও না এই শহরের সবচেয়ে ধনী লোকের কাছে। তিনি খুব দয়ালু ও উপকারী। গরিবের দুঃখ তিনি দূর করতে চান। নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন।

এই শুনে গরিব লোকটি বললেন—না, না, তা হবে কেন? না-খেতে পেয়ে মারা যাব তা-ও ভালো—কিন্তু অন্যের সাহায্য নিয়ে বেঁচে থাকা খুব কষ্টের। কারও অনুগ্রহ আমি কামনা করি না। ভিক্ষা করে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো। আর যাই হোক, আমার মনে অপার শান্তি আছে। আমি মনে শান্তি নিয়েই বেঁচে থাকতে চাই।

দুই বন্ধু

দেশের নাম খোরাশান। ভারি সুন্দর এক দেশ।

সেই দেশে ছিল দুইজন সাধু ব্যক্তি।

একজন ছিল বেশ মোটাসোটা। খেতে খুব পছন্দ করত। দিনে দুইবার ভালো ভালো খাবার পেটপুরে না-খেলে তার শান্তি হত না।

অন্যজন ছিলেন সম্পূর্ণ আলাদা। শরীর ছিল লিকলিকে। হাড়-জিরজিরে দেহ। খাওয়াদাওয়া একদম পছন্দ করত না। দুইদিন পরে একদিন খেত সে।

দুজনের আবার ভারি বন্ধুত্ব।

একবার তারা একসঙ্গে দেশভ্রমণে বের হল। পাহাড়-পর্বত ছাড়িয়ে, বন-জঙ্গল পেরিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল তারা। নতুন দেশ, নতুন মানুষ—নিত্যনতুন অভিজ্ঞতা। খুব ভালো লাগছে তাদের। আনন্দে আনন্দে কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো।

এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন নতুন এক শহরে এল তারা। শহরে ঢোকামাত্র গ্রেফতার করা হল তাদের। বাদশাহ'র সেপাইরা ধরে নিয়ে গেল কাজির দরবারে। বিচারে রায় দেয়া হল—এরা গুপ্তচর।

সাধু দুইজন বলতে থাকে : আমরা নিরপরাধ, আমাদের কোনো দোষ নেই। আমরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমরা নিরীহ মানুষ।

কিন্তু কেউ তাদের কথা শুনল না।

তাদের দুজনকে বন্দি করে রাখা হল একটা চোর-কুঠুরিতে। দরজা বন্ধ করে দেয়া হল। না–খেতে পেয়ে ওরা যেন মারা যায়—এর চেয়ে ভয়ংকর শাস্তি আর কী হতে পারে!

কিছুদিন পরে অবশ্য প্রমাণ পাওয়া গেল, সেই দুজন আসলে গুপ্তচর নয়। তারা সাধু ব্যক্তি। মনের আনন্দে বেরিয়েছে দেশ ঘুরতে।

বাদশাহ'র লোকেরা গেল বন্দিদের মুক্ত করতে। দরজা ভেঙে উদ্ধার করতে হবে ওদের। কিন্তু এতদিন না-খেয়ে থাকলে মানুষ তো বাঁচতে পারে না। নিশ্চয়ই ওরা বেঁচে নেই।

দরজা খুলে অবাক হল সেপাইরা। একজন তখনও বেঁচে আছে। যে বেচারা হাড়-জিরজিরে, রোগা-পটকা দেহ সে-ই মারা যায়নি। মোটা-জন পটল তুলেছে। সকলেই অবাক।

তখন একজন জ্ঞানীলোক বলল : এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। মোটা লোকটাই মারা যাবে। কারণ সে ছিল ভোজনরসিক। খাবার ছাড়া তার একমুহূর্ত চলে না। খাবার না-পেয়ে সে মারা গেছে। কিন্তু শুকনো লোকটা খুব সংযমী। না-খেয়ে থাকার অভ্যেস তার আছে। সে বন্দি কারাগারে অনশন পালন করেছে।

জ্ঞানীলোকটি তখন সকলের উদ্দেশে বলল : যারা অভাবের মধ্যে দিন কাটায় তারা অভাবকে সহ্য করতে পারে। কিন্তু যারা ভোগবিলাসে জীবন কাটায় তারা সামান্য বিপদেই কাতর হয়ে পড়ে। এমনকি মারাও যায়। ওদের দুজনের ভাগ্যে সেরকম ঘটনা ঘটেছে।

জুতোর দুঃখ

এই গল্পটি শেখ সাদীর মুখেই শোনা যাক :

একদা ছিল না জুতো চরণযুগলে। অর্থাৎ আমার জুতো নেই। টাকাপয়সাও নেই। টাকার অভাবে জুতো কিনতে পারছি না। মনে খুব দুঃখ। অভাবে পড়লে জীবনের চাওয়া-পাওয়া নষ্ট হয়ে যায়।

আমার অবস্থা বেগতিক।

জুতোর দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছি একদিন। দোকানে থরে থরে সাজানো রঙবেরঙের কত জুতো। কিন্তু আমার কেনার সামর্থ্য নেই।

হঠাৎ করেই চোখ পড়ল একজন লোকের দিকে। তাকিয়ে দেখি লোকটা রাস্তার ধারে গড়িয়ে গড়িয়ে হাঁটছে। লোকটা খোঁড়া। তার পা দুখানিই নেই।

জুতো নেই বলে আমার দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু বেচারার পা নেই। তার দুঃখ আমার চেয়ে আরো অনেক বেশি। আমি তো তবে ওর চেয়ে অনেক সুখেই আছি।

জুতো না-থাকার বেদনা আমি মুহূর্তেই ভুলে গেলাম। কারণ ঐ লোকটার চেয়ে আমার অবস্থা অনেক অনেক ভালো।

হাসিঠাট্টা

একজন ব্যবসায়ী। খুব বুদ্ধিমান। কিন্তু বেচারা হঠাৎ করে ব্যবসায় বেশকিছু টাকা লোকসান করে ফেলল। কী আর করা! ব্যবসা করতে গেলে লাভ-লোকসান তো থাকবেই।

ব্যবসায়ীর একটি মাত্র পুত্র। সে বাবার সঙ্গে ব্যবসা করত। পিতা একদিন পুত্রকে ডেকে বললেন—লোকসান হয়েছে বলে ভেঙে পড়ো না। লোকসানের কথা লোকজনকে বলার কোনো দরকার নেই।

পুত্র তো এই শুনে অবাক!

কেন বাবা?

বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী-পিতা তখন বললেন—লোকসানের দুঃখেই আমরা কাতর। লোকে যদি জানতে পারে তবে দুঃখ হবে দ্বিগুণ। ক্ষতির দুঃখ আছেই, তার ওপরে লোকে জানলে আমাদের নিয়ে হাসিঠাট্টা করবে, অহেতুক উপহাস করবে—সেই দুঃখ সহ্য করা আরো কঠিন হবে।

যদিও খুব অন্যায় তবু লোকে অন্যের বিপদ দেখলে আনন্দিত হয়।

বিশ্বাস

গজনীর সুলতান মাহমুদ।

খুব বিখ্যাত একজন শাসক, যোদ্ধা এবং বীর। তাঁর একজন সভাসদ ছিলেন। খুবই বিশ্বস্ত। নাম তাঁর হোসেন।

প্রায় প্রতিদিনই সুলতানের সঙ্গে কোনো-না-কোনো বিষয় নিয়ে তাঁর শলাপরামর্শ হত। সেসব আলোচনা ছিল খুবই গোপনীয়। একদিন দীর্ঘক্ষণ ধরে আলোচনা চলছে সুলতান ও সভাসদ হোসেনের মধ্যে।

আলোচনা শেষে হোসেন বেরিয়ে এলেন বাইরে। কয়েকজন লোক তাঁকে ঘিরে ঘরল—সুলতানের সঙ্গে আপনার এতক্ষণ কী কী বিষয়ে পরামর্শ হল আমরা জানতে পারি কি?

হোসেন একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ওদের দিকে। তারপর বললেন—এই বিষয়টা জানার জন্যে সুলতানের সঙ্গেই আপনাদের কথা বলাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি?

লোকগুলো কিছুক্ষণের জন্যে থমকে গেল। পরে একজন বলল—বুঝতে পেরেছি, আপনি বিষয়টা গোপন রাখতে চাইছেন আমাদের কাছে।

হোসেন বললেন—এটা তো পানির মতো সহজ বিষয়। গোপন রাখব বলেই তো সুলতানের আমি এত বিশ্বাসভাজন। আমাকে মেরে ফেললেও আমি সুলতানের বিশ্বাস ভঙ্গ করব না।

বিশ্বাস ভঙ্গ করা মহাপাপ।

গুণের আদর

নাম তার আয়াজ।

দেখতে-শুনতে খুব একটা সুন্দর নয়। যেমন বেঁটে তেমনই কালো। চোখদুটো কুতকুতে। তোতলা। কথা বলতে গেলে জিভ জড়িয়ে আসে।

কিন্তু সুলতান মাহমুদ তাকে খুব ভালোবাসেন। সুলতানের অনুচরদের মধ্যে সে খুব প্রিয়। অন্যরা তাই খুব হিংসা করত আয়াজকে। রূপবান এবং শক্তিমান এত অনুচর থাকতে আয়াজকে কেন এত পছন্দ করেন সুলতান?

এই প্রশ্ন সকলের।

একদিন সুলতান মাহমুদের সভাসদ হোসেন এলেন অনুচরদের আস্তানায়। কয়েকজন অনুচর তাকে ঘিরে ধরল। তারা জিজ্ঞেস করল—

এত শক্তিমান, রূপবান অনুচর থাকতে আমাদের প্রিয় সুলতান কেন আয়াজকে বেশি ভালোবাসেন?

প্রশ্ন শুনে হোসেন মিটিমিটি হাসলেন।

—রূপের চেয়ে গুণের মূল্য অনেক বেশি। রূপ দেখে আমরা মুগ্ধ হই বটে কিন্তু মর্যাদা দিই গুণীব্যক্তিকে। মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে গুণ দিয়ে, রূপে নয়। যে সকলকে ভালোবাসে, দেখতে অসুন্দর হলেও সে সকলের ভালোবাসা পাবে। পৃথিবীর যাঁরা বিখ্যাত মানুষ তাঁরা সকলেই গুণের কারণে বিখ্যাত হয়েছেন—রূপের কারণে নয়।

আমাদের আয়াজ তোমাদের সকলের মধ্যে সবচেয়ে গুণবান। সুলতান মাহমুদ গুণের সমাদর করতে জানেন। তাই তিনি আয়াজকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন। তোমরাও রূপবান হওয়ার চেয়ে গুণবান হওয়ার চেষ্টা করো। তাহলে জীবনে উন্নতি করতে পারবে।

জীবন-মৃত্যু

বয়স তাঁর প্রায় একশো বছর।

অতি বৃদ্ধ এক লোক। কঠিন তার অসুখ। এই বুঝি তাঁর প্রাণ যায়—এরকম অবস্থা। মৃত্যুশয্যায় সেই বুড়োলোকটা গোঙাতে লাগল। বিড়বিড় করে সে কথা বলছে ফারসিভাষায়।

কিন্তু বুড়োর মৃত্যুশয্যায় যারা উপস্থিত হয়েছেন তাদের কেউই অবশ্য একবর্ণ ফারসি বোঝে না। ভারি মুশকিল। মৃত্যুশয্যায় মানুষ অনেক প্রয়োজনীয় কথা বলে। এইসব কথা না-বুঝলে চলবে কী করে!

লোকজনেরা ছুটে গেল কবি শেখ সাদীর কাছে। কারণ শেখ সাদী একজন জ্ঞানী মানুষ। তিনি কবিতা লেখেন। একজন বলল,

—কবি, শিগগির চলুন। এক বুড়ো মৃত্যুশয্যায় কী বলছেন তা কেউই বুঝতে পারছে না।

শেখ সাদী দ্রুত এসে উপস্থিত হলেন বুড়োর রোগশয্যায়। বুড়ো তখন কবিতা আবৃত্তি করছেন। সেই কবিতার অর্থ হল : হায়রে জীবন! এই জীবনে কত কিছু দেখার ছিল। কিছুই না-দেখে আমাকে মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে। বাগানে ঘুরে ঘুরে একটা গোলাপের পাশেই মরে গেলাম। পুরো বাগানটা আমার দেখা হল না।

বুড়োর বেঁচে থাকার আগ্রহ দেখে কবি শেখ সাদী ভারি অবাক হলেন। সকলে কবিতার অর্থ শুনে একেবারে চোখ কপালে তুলল। একশো বছর বেঁচে থেকেও বুড়ো আরো বাঁচতে চাইছেন।

কবি তাঁকে প্রশ্ন করলেন—আপনি কেমন আছেন? এখন কেমন লাগছে আপনার?

বুড়ো মৃদুস্বরে জবাব দিল—এই জীবনের চেয়ে প্রিয় আর কী আছে? একটা দাঁত তোলার ব্যথা সারাজীবনে ভোলা যায় না। কিন্তু আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে—এই যন্ত্রণার কথা আমি কী করে বর্ণনা করি।

শেখ সাদী তখন বললেন—আপনি শান্ত হন। মানুষ কখনও চিরদিন বাঁচে না। একদিন-না-একদিন মানুষকে মরতে হবেই। শরীর

থাকলে অসুখবিসুখ থাকবেই। আমরা চিকিৎসক ডেকে আনি। তিনিই ব্যবস্থা করবেন।

তখন বুড়ো বললেন—অনেক কথাই বলা যায়। কিন্তু সময় ও স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না। যে বাড়ির দেয়ালের রং নষ্ট হয়ে গেছে, চুন-সুরকি খসে গেছে, সেই বাড়ির চুনকাম করার কোনো মানে হয় না। আজ আমি বুড়ো হয়েছি, জীবনের শেষপর্যায়ে এসেছি, চিকিৎসক এনে আর লাভ কী! চিকিৎসক কি আমার যৌবন ফিরিয়ে দিতে পারবে?

বলেই বুড়ো হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

শেখ সাদীর মুখে সান্ত্বনার কোনো ভাষাই নেই। বুড়োর মৃত্যুশয্যায় তিনি স্থিরভাবে বসে রইলেন।

শিক্ষকের মর্যাদা

এই গল্পটা একজন জ্ঞানী শিক্ষককে নিয়ে।

তাঁর ছাত্র ছিল এক বাদশা'র ছেলে।

শিক্ষকের কর্তব্য ছাত্রকে শিক্ষা দেয়া। এই শিক্ষক ছিলেন খুবই আদর্শবাদী। যা সত্য বলে জানতেন তাই করতেন। ধনী-গরিব, ছোট-বড় বলে তিনি কিছু মানতেন না। সকল ছাত্রের প্রতি ছিল তাঁর সমান নজর। বাদশাহ'র ছেলেকে তিনি আলাদা চোখে দেখতেন না।

বাদশাহ'র ছেলেটা ছিল খুব দুষ্টু। পড়াশোনায় তার একটুও মনোযোগ ছিল না। কাউকে সে পরোয়াও করত না। শিক্ষক তাই বাদশাহ'র ছেলেকে মাঝেমধ্যেই শাসন করতেন। এমনকি তাকে বেত্রাঘাত করতেও দ্বিধা করতেন না।

একদিন ছেলেটি সহপাঠীদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করল। শিক্ষক জানতে পেরে ডেকে পাঠালেন ছেলেটিকে। তারপর বেদম পিটালেন। ছেলেটি রাগে অভিমানে দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরল। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন—তোমার কান্নার কারণ কী?

ছেলেটি সবিস্তার শিক্ষকের ওপর সব দোষ চাপাল। বাদশাহ খুব অখুশি হলেন। ডেকে পাঠালেন শিক্ষককে।

—আপনি আমার পুত্রকে এত মারধোর করেন। কিন্তু কেন?

আদর্শবান শিক্ষক বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। বাদশাহ'র সামনে দাঁড়িয়ে নির্ভীক উচ্চারণে বললেন—আমাকে মাফ করবেন। আপনার পুত্র আগামীদিনে আমাদের বাদশাহ হবে। তার দায়িত্ব অনেক। আমি তাকে সৎ ও সুন্দর শিক্ষা দিয়ে বড় করে তুলতে চাই। ভবিষ্যতে সে যেন একজন সুশাসক হয়। তাই চেষ্টার কোনো ত্রুটি করি না। আমার যদি ভুল হয়ে থাকে তবে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

শিক্ষকের কথা শুনে বাদশাহ খুব খুশি হলেন। প্রচুর বখশিশ দিয়ে তিনি বিদায় করলেন শিক্ষককে। বললেন—একজন ভালো শিক্ষকই পারে একটি জাতিকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে। আপনার মতো শিক্ষক আমাদের আরো প্রয়োজন।

যুদ্ধ দেখে পলায়ন

আজ থেকে অনেক অনেক বছর আগে। সিরিয়ার ধু-ধু মরুভূমি দিয়ে একদল যাত্রী চলেছে তাদের গন্তব্যস্থানে। তখন পথে চলাচল করা খুব কষ্টের ব্যাপার ছিল। কারণ যেখানে-সেখানে দস্যুদল ওত পেতে থাকত। যে-কোনো সময় তারা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে এবং সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যেতে পারে। যাত্রীদলে সবাই খুব ভালো মানুষ। স্বাভাবিকভাবে ভয়টাও তাদের বেশি।

এমন সময় তাদের সঙ্গে এসে জুটল এক যুবক। ভাবভঙ্গিতে মনে হল, দুর্দান্ত সাহসী সে। হাতে তীর-ধনুক। কথা বলে চটপট। হুংকার দেয় মাঝে মাঝে। যেন সে একাই দশজন ডাকাতকে পরাস্ত করতে পারবে।

এরকম একজন সাহসী যুবককে সঙ্গে পেয়ে যাত্রীদল বেশ নিশ্চিন্ত হল। পথে দস্যুর ভয় অন্তত আর নেই।

ছেলেটি শক্তিশালী বটে কিন্তু তার যুদ্ধের কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। সে কখনও সামনাসামনি লড়াই করেনি। সে জানে না, আক্রান্ত হলে কেমন করে যুদ্ধ করতে হয়। জীবন কেটেছে তার আরাম-আয়েশে। যাত্রীদল তবু আশ্বস্ত। এরকম একজন বীর সঙ্গে থাকতে আবার ভয় কী!

যাত্রীদল চলেছে।

মরুভূমির দুর্গম পথ পেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ করে একদিন দস্যুদলের মুখোমুখি হল তারা। দলে মাত্র দুইজন দস্যু। একজনের হাতে একটা লাঠি। সে লাঠিটা বনবন করে ঘোরাতে লাগল। আরেকজন বড় বড় পাথর ছুড়ে মারতে লাগল।

দস্যু দেখে যাত্রীদলের মাথা খারাপ। বীরপুরুষের হাত-পা কাঁপতে লাগল। এতক্ষণ তীর-ধনুক নিয়ে তার আস্ফালন ছিল। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাত থেকে তীর-ধনুক পড়ে গেল।

দস্যু দুজন খুব সহজেই যাত্রীদলের কাছ থেকে টাকাপয়সা, সোনাদানা সব কেড়ে নিল। যাত্রীদলের মাথায় হাত। সর্বস্ব খুইয়ে এখন তারা নিঃস্ব। কিছুক্ষণ পর টের পাওয়া গেল, বীর যুবকটি পালিয়ে গেছে।

মনে রাখতে হবে যার কোনো অভিজ্ঞতা নেই তাকে দিয়ে কোনো কাজ হয় না। যে অসময়ে দম্ভ দেখায় এবং কথা বেশি বলে তার ওপরে আস্থা রাখতে নেই। কথায় বলে, অভিজ্ঞ শিকারি কৌশলে বাঘ ধরতে পারে কিন্তু অনভিজ্ঞ শক্তিমান বীর বাঘের পেটে যায়।

দয়ালু হাতেম তাই

হাতেম তাইকে নিয়ে অনেক গল্প আছে। তিনি ছিলেন একজন মহানুভব, পরোপকারী ব্যক্তি। গরিব-দুঃখীর বন্ধু। মানুষের জন্য জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে তিনি প্রস্তুত। মানুষের মুখে-মুখে ছিল হাতেম তাইয়ের গুণের কথা। তারা ভাবত—এরকম মহামানব দুনিয়াতে দুটি নেই।

একদিন।

কয়েকজন লোক গেল হাতেম তাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে। তারা বলল—আপনার চেয়ে হৃদয়বান ও গুণবান মানুষ পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

হাতেম তাই বিনীতভাবে বলল—না, না, এই কথা ঠিক নয়। আমি একজন সামান্য মানুষ। আমার চেয়ে গুণবান ব্যক্তি অনেকে আছে। আমরা তাঁদের দেখতে পাই না।

কৌতূহলী লোকজন জানতে চাইল—কোথায় তাঁরা?

—সবখানেই আছেন তাঁরা। যেমন সামান্য একটা ঘটনার কথা বলছি তোমাদের। একবার চল্লিশটা উট কোরবানি দিলাম আমি। সকলকেই দাওয়াত করলাম। আমির থেকে ফকির সবাই আমার নিমন্ত্রিত অতিথি। খানাপিনার ঢল বয়ে গেল আমার বাড়িতে।

বিশেষ এক কাজে আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে সেদিন বাইরে যেতে হয়েছিল। পথে যেতে যেতে নজরে পড়ল, একজন কাঠুরিয়া কাঠ কাটছে। তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কিহে ভাই, কাঠ কাটছ কেন? সেখানে গেলেই তো আজ খানা পাবে।

কাঠুরিয়া ক্লান্তভাবে আমার দিকে তাকাল—আমি পরিশ্রম করে খাই। যতদিন শরীরে শক্তি আছে ততদিন কাজ করে খাব। কোনো ব্যক্তির আতিথেয়তা বা অনুগ্রহ লাভ করে আমি বেঁচে থাকতে চাই না।

হাতেম তাই তখন কৌতূহলী লোকগুলোর উদ্দেশে বললেন—এই যে একজন সামান্য কাঠুরিয়া, নিশ্চিতভাবে সে আমার চেয়ে অনেক বেশি গুণী ব্যক্তি। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে আসে।

যখন খিদে লাগে

বসরার নাম শুনেছ তো?

গোলাপফুলের শহর। খুব বিখ্যাত জায়গা। বসরার স্বর্ণকারদের দোকানে বসে গল্প করছিল এক পথিক। পথিক ঘুরে বেড়ায় মরুভূমিতে। যায় এক দেশ থেকে আরেক দেশে। সে বলছিল—একবার মরুভূমির মধ্যে পথ হারিয়ে ফেললাম। সে এক দারুণ ভয়ানক অভিজ্ঞতা।

এদিকে যাই, ওদিকে যাই, পথ আর খুঁজে পাই না। পেটে খিদে, তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে, দুশ্চিন্তায় ভয়ে আতঙ্কে শরীর হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আমি ভেবে নিলাম—আজ আমার জীবনের শেষদিন। মৃত্যু এখন আমার সামনে উপস্থিত। পথ খুঁজে পাওয়ার কোনো উপায়ই আর পাচ্ছি না।

এমন সময়—কিছুদূরে দেখতে পেলাম একটা থলে পড়ে আছে। মনটা কিছুক্ষণের জন্যে আনন্দে ভরে গেল—যাক, থলেতে খাবারদাবার হয়তো কিছু পাওয়া যাবে। দ্রুত ছুটে গেলাম থলেটার দিকে।

হায়রে কপাল, থলেটা খুলে দেখি—সেখানে এক মূল্যবান পাথর। আলো ঝলমল করছে। পরম দুঃখে পাথরটা আমি ছুড়ে ফেলে দিলাম। তারপর আবার খাবারের সন্ধানে, পানির সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

স্বর্ণকারদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করল—পাথরটা ফেলে দিলে কেন? ওটা সঙ্গে রাখলেই পারতে। পরে ওটা তোমার কাজে লাগত।

পথিক মৃদু হাসল। বলল—ক্ষুধায় কাতর ব্যক্তির কাছে সামান্য খাবার পানির মূল্য পৃথিবীর সকল মণিমানিক্যের মূল্যের চেয়েও অনেক বেশি।

ভুল চিকিৎসা

একজন লোকের চোখে অসুখ হয়েছে। সারাক্ষণ চোখ থেকে পানি ঝরে। জ্বালা-যন্ত্রণা হয়। একদিন সে এক পশু-চিকিৎসকের কাছে গেল। তার অসুখের কথা সবিস্তারে বলল।

চিকিৎসক সব শুনলেন। তারপর পশুদের চোখের ওষুধ দিলেন লোকটার চোখে। ভুল চিকিৎসায় বেচারা প্রায়-অন্ধ হয়ে গেল। রাগে-ক্ষোভে সে গেল কাজির কাছে।

—আমি এর বিচার চাই।

কাজি সব শুনে চিকিৎসককে কোনো সাজাই দিলেন না। বেকসুর খালাস করে দিলেন।

আর লোকটিকে বললেন—দোষ আপনার। আপনি কোন্ বুদ্ধিতে পশু-চিকিৎসকের কাছে গেলেন? আপনি কি একজন পশু? পশু-চিকিৎসক আপনাকে পশু ভেবে চিকিৎসা করেছে। এর মধ্যে কোনো অন্যায় নেই।

চতুর

একজন ভালোমানুষের কাছে চতুর এক লোক এসে পায়ে লুটিয়ে পড়ল। মুখে তার কথার খই ফোটে।

ভাইরে, আমি বড়ই বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। আমার বিপদের কথা কীভাবে যে বলি আপনাকে?

না, না, বলে ফ্যালো, শিগগির বলো। সদাশয় ভালোমানুষটি অভয় দিল।

একবার বিপদে পড়ে একজনের কাছ থেকে দশটি টাকা ধার করেছিলাম। সেই টাকা এখনও শোধ দিতে পারিনি। পাওনাদারের তাগাদায় আমার জীবন প্রায় বিপন্ন। টাকা শোধ দিতে না-পারলে সে এখন আমাকে ধরে-বেঁধে নিয়ে যাবে। আমাকে মারধোর করবে। আমি এখন কী করব? আমাকে এই বিপদ থেকে একমাত্র আপনিই বাঁচাতে পারেন।

ভালোমানুষ লোকটি আর কিছু জানতে চাইলেন না। সঙ্গে সঙ্গে দশটি টাকা দিয়ে দিলেন।

চতুর লোকটি বিদায় হল।

তখন পাশে বসে থাকা একজন লোক সাধু ব্যক্তিটিকে জিজ্ঞেস করল—লোকটির কাতর অনুনয়-বিনয়ে আপনি তাকে টাকা দিয়ে দিলেন? এমনও তো হতে পারে লোকটা মিথ্যা বলে টাকা নিয়ে গেল।

সাধু ব্যক্তিটি বললেন—সেটা আমার দেখার ব্যাপার নয়। লোকটি বিপদের কথা বলে আমার কাছ থেকে টাকা নিল। সত্যি যদি সে বিপদে পড়ে থাকে তবে আমি তাকে সাহায্য করলাম। এতে আমার পুণ্য হবে। আর যদি ছলনা করে থাকে তবে পরে সে যেন আর আমাকে জ্বালাতন না করতে পারে—এইজন্য টাকা দিয়ে দিলাম। সৎলোকদের সাহায্য করতে হয়। আবার অসৎ লোকদের অখুশি রাখলেও চলে না।

পালাবদল

এক দরিদ্র ভিক্ষুক সারাদিন পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে। ক্ষুধায় পিপাসায় কাতর হয়ে সে এল এক ধনী লোকের বাড়ির দরজায়।

—ও ভাই আমাকে একটু ভিক্ষা দিন। আমি খুব ক্ষুধার্ত।

ধনী লোকটি বলল—না হে, এখানে কোনো ভিক্ষাটিক্ষা দেয়া হয় না। তুমি অন্য কোথাও দ্যাখো।

ভিক্ষুক তবুও দাঁড়িয়ে রইল। মালিক তখন তার বাড়ির কাজের ছেলেটাকে পাঠাল। যাও ওকে বিদায় করো।

কাজের ছেলেটি গিয়ে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে ভিক্ষুককে বিদায় করল। ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক বেচারা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে চলল অন্য দরজায়।

এই ধনী লোকটি ছিল খুবই অত্যাচারী, অহংকারী। মানুষকে সে মানুষ বলেই মনে করে না। কিছুদিন পরে তার কপালে নেমে এল দুর্ভোগ। ব্যবসা করতে গিয়ে সব টাকা লোকসান করে লোকটি একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেল। এখন সে পথের ভিক্ষুক। চাকর ছেলেটিও কাজ নিয়ে চলে গেল অন্যত্র আরেক ধনী ব্যক্তির বাড়িতে। সেই ধনী ব্যক্তিটি ছিল খুবই ভালো। হৃদয়বান এবং মানুষের মর্যাদা দিতে জানত সে।

একদিন এক ভিক্ষুক এসে হাজির হল এই ধনী ব্যক্তিটির বাড়িতে।

ভাই, আমি খুব ক্ষুধার্ত। কিছু খাবার চাই।

ধনী ব্যক্তিটি সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষুকের খাবারদাবারের ব্যবস্থা করলেন। রাত্রে থাকার ব্যবস্থা করলেন। আর প্রভুভক্ত চাকরটিকে বললেন, লোকটির আদর-আপ্যায়নে যেন কোনো ত্রুটি না হয়।

চাকরটি খাবার নিয়ে ভিক্ষুকের কাছে পৌছতেই অবাক হয়ে গেল। আরে, এ যে তার পুরনো প্রভু! মানুষের ভাগ্য কত দ্রুত বদলে যায়। চাকরটির চোখে পানি এসে গেল। জল ছলছল করতে লাগল চোখে। ধনী ব্যক্তিটি জিজ্ঞেস করল—ব্যাপার কী? তোমার চোখে পানি কেন?

হুজুর, আমি একদিন এই লোকটির বাসায় কাজ করতাম। কিন্তু লোকটি ছিল খুবই অহংকারী। আজ সে পথের ফকির।

ধনী ব্যক্তিটি তখন বলল—তাইতো বলি, লোকটিকে তো আমারও চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। একদিন আমিও ভিক্ষুক ছিলাম। পথে পথে ঘুরে বেড়াতাম। ঐ ব্যক্তির বাড়িতে ভিক্ষা চাইতে গিয়েছিলাম। গলাধাক্কা দিয়ে আমাকে বের করে দেয়া হয়। আজ দিন বদলে গেছে। ভাগ্য ফিরেছে আমার। আমি আজ ধনী ব্যক্তি। আমাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল যে-ব্যক্তি সে আজ পথের ভিক্ষুক। সে আজ আমার অতিথি।

এই হচ্ছে মানুষের জীবন। মানুষ যদি কোনো অন্যায় কাজ করে সে তার কর্মফল পায়। আজ যে আমির কাল সে ফকির, আজ যে ফকির কাল সে আমির—এই হচ্ছে পৃথিবীর নিয়ম।

ঘোড়া

হাতেম তাইকে নিয়ে অনেক গল্প আছে।

দানশীল, মহৎপ্রাণ এই ব্যক্তিটি ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন মানুষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসার জন্য।

হাতেম তাইয়ের একটা ঘোড়া ছিল, খুবই প্রিয় ঘোড়া। ঘোড়াটা নিয়েই এই গল্প। ঘোড়াটা ছুটত ঝড়ের মতো। ফুলে ফুলে উঠত কেশর। চিঁহি চিঁহি ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ত আকাশে বাতাসে। ঘোড়াটির সুনাম ছড়িয়ে পড়ল দূর দূর দেশে। রোমের বাদশাহ'র কানে গিয়ে পৌঁছাল এই ঘোড়ার কথা।

বাদশাহ'র ঘোড়া সংগ্রহ করার বাতিক ছিল। তিনি জানতেন হাতেম তাই একজন দানশীল ব্যক্তি। তিনি একদল দূত পাঠালেন হাতেম তাইয়ের কাছে। ঘোড়াটি তার দরকার। হাতেম তাই যদি ঘোড়াটি উপহার দেয় তাতেই বোঝা যাবে তার হৃদয় কত মহৎ।

বহুদিন ধরে, বহু পথ পেরিয়ে দূতেরা এল হাতেম তাইয়ের বাসভবনে। পরম সমাদরে হাতেম তাই অতিথিদের বরণ করলেন। তাদের থাকার ব্যবস্থা করলেন। খাবার আয়োজন করলেন। অতিথি আপ্যায়ন হচ্ছে মানুষের প্রধান কর্তব্য।

পরদিন দূতেরা রোমের বাদশাহ'র প্রস্তাব জানাল হাতেম তাইকে। লোকমুখে বাদশাহ শুনেছেন, হাতেম তাইয়ের একটা সুন্দর ঘোড়া আছে। উপহার হিসেবে বাদশাহ ঘোড়াটা সংগ্রহ করতে চান। এই-না শুনে হাতেম তাই খুব দুঃখিত হয়ে উঠলেন।

হায়, হায়, এই কথা তোমরা গতকাল আমাকে বলোনি কেন? গতরাতে তোমাদের আপ্যায়ন করানোর জন্যে সেই ঘোড়াটিকে জবাই করা হয়েছে। কারণ তোমাদের জন্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভালো খাবার আমার ঘরে ছিল না। আমার পশুপাখি সংগ্রহশালাটি বাড়ি থেকে অনেক দূরে। তোমরা পথশ্রমে খুব পরিশ্রান্ত ছিলে। দেরি হয়ে যাবে ভেবে ঐ ঘোড়াটিকেই জবাই করেছি। এখন কী হবে?

দূতেরা হাতেম তাইয়ের মহৎ গুণে অবাক হয়ে গেলেন। হাতেম তাই অন্য অনেক ঘোড়া ও প্রচুর ধনরত্ন উপহার দিলেন রোমের বাদশাহকে। অতিথিদেরও উপহার দিলেন প্রচুর পরিমাণে।

রোমের বাদশাহ সব ঘটনা শুনে বিস্মিত হলেন।

হাতেম তাইয়ের নামে ধন্য ধন্য রব পড়ে গেল চারদিকে।

মহৎ যিনি তিনিই বড়

গাধার পিঠে চড়ে লোকটা যাচ্ছিল। অনেক জরুরি কাজ তার। গাধা পথে যেতে যেতে পড়ে গেল গর্তে। গাধা তো গাধাই—বেচারা আর উঠতে পারে না। লোকটাও অনেক চেষ্টা করল গাধাটাকে ওঠানোর। কাজ হল না।

লোকটার তখন মেজাজ খারাপ।

সে গাধাটাকে যা-তা বলে গালাগালি শুরু করল। সময় যাচ্ছে আর লোকটার রাগও বাড়ছে। কে রাজা কে প্রজা, কে শত্রু, কে মিত্র—সবাইকেই সে একধারসে গালি দিচ্ছে।

মানুষ রেগে গেলে তার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়। লোকটারও তাই হল। রাগে, ক্ষোভে, বিরক্তিতে সে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করল।

এমন সময় ঐ-পথ দিয়ে যাচ্ছিল সেই দেশের বাদশাহ। লোকটার কাণ্ড দেখে বাদশাহ খুব অবাক হলেন। গাধা কাদায় পড়েছে। কিন্তু লোকটা সেই রাগে সবাইকে গালাগালি করছে কেন?

বাদশাহ'র সহচররা ভয়ানক উত্তেজিত। তরবারির এক কোপে লোকটার মুণ্ডুটা ধড় থেকে নামিয়ে দেয়া দরকার। মৃত্যুদণ্ডই ওর একমাত্র শাস্তি।

বাদশাহ এসব কথায় কর্ণপাত করলেন না।

তিনি বিবেচনা করে দেখলেন, লোকটা আসলেও খুব বেকায়দা অবস্থায় পড়েছে। এ অবস্থায় কারও মেজাজ ঠিক থাকার কথা নয়। বাদশাহ কোমলস্বরে লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন—ব্যাপারটা কী?

লোকটা তখন সবিস্তারে সব বলল।

বাদশাহ বললেন—তাহলে আমাদের উচিত তোমাকে সহযোগিতা করা।

বাদশাহ তার সহচরদের সঙ্গে নিয়ে গর্ত থেকে গাধাটিকে উদ্ধার করলেন।

লোকটি যারপরনাই প্রীত হল।

বাদশাহ কিছু অর্থও সাহায্য করলেন লোকটিকে।

তারপর বললেন—আমি হচ্ছি এই দেশের বাদশাহ। আমার রাজ্যে কেউ বিপদে পড়ে আমাকেই গালাগালি করবে, এ হতে পারে না। বাদশাহ হয়েও আমি তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। তোমার বিপদে আমি সমব্যথী।

বাদশাহের কথা শুনে লোকটা মাটির সঙ্গে প্রায় মিশে গেল। তার রাগ, ক্ষোভ কমে গেছে। সে এখন সুস্থ মানুষ। বরং লজ্জায় সে কাতর হয়ে উঠল। বাদশাহ'র সামনে মাথা নত করে সে বলল—আপনি মহৎ মানুষ। আপনি উত্তেজিত না-হয়ে আমার সঙ্গে যে আচরণ করলেন তা একমাত্র আপনার পক্ষেই সম্ভব। তাই আপনি একজন মহৎপ্রাণ শাসক। আমি সামান্য একজন প্রজা।

কৃপণের গল্প

এক ছিল কৃপণ লোক।

প্রচুর তার টাকাপয়সা। কিন্তু নিজের জন্য এক কানাকড়ি সে খরচ করত না। পয়সা খরচ হবে বলে ঠিকমতো খায় না। রাতদিন তার মাথায় একটাই

চিন্তা—কী করে আরো টাকাপয়সা আয় করা যায়। টাকা জমাতে হবে, প্রচুর সম্পদশালী হতে হবে তাকে।

লোকটি যেমন কিপটে, ছেলেটি ছিল তার সম্পূর্ণ উলটো। সে দুহাতে টাকাপয়সা ওড়াত। বাবা যেখানে টাকা লুকিয়ে রাখে সেই গোপন স্থানের সন্ধান সে পেল; তাকে আর পায় কে! সমস্ত টাকাপয়সা হাতিয়ে নিয়ে সেখানে সে রেখে দিল কিছু পাথরের টুকরো।

তারপর তার ফূর্তি দেখে কে!

বন্ধুবান্ধব সঙ্গে নিয়ে আনন্দ করে বেড়াতে লাগল সে। টাকা খরচ করে বলে অনেক বন্ধুবান্ধবও জুটে গেল।

কিছুদিন পরে কৃপণ লোকটি জানতে পারল—তার বহুদিনের জমানো টাকা চুরি হয়ে গেছে। মনের দুঃখে লোকটি দুদিনেই বুড়ো হয়ে গেল। খাওয়াদাওয়া ছেড়ে সারাদিন কেবল বিলাপ করছে : হায় হায় আমার এ কী হল!

ছেলেটি এসব জানতে পেরে বাবাকে একদিন এসে বলল : বাবা, তুমি নাকি দারুণ ভেঙে পড়েছ।

কৃপণ লোকটি হাহাকার করে উঠল : হ্যাঁ বাবা, আমার সব শেষ হয়ে গেছে। টাকার বদলে কিছু পাথর এখন আমার সঞ্চয়ে।

এই শুনে ছেলেটি খুব মজা পেল।

আমাদের জীবনে টাকার প্রয়োজন কী বাবা? আমরা একটু সুখে-শান্তিতে থাকতে চাই—এই কারণেই তো মানুষ টাকা আয় করে। কিন্তু সেই টাকা যদি আমাদের জীবনে কোনোই কাজে না-লাগে তবে তার মূল্য কোথায়? তখন টাকা আর পাথর দুই-ই তো একই জিনিস। দুটোই মূল্যহীন। তুমি যেভাবে জীবন কাটাও সেটা কোনো মানুষের জীবন নয়।

—তাহলে, মানুষ কেন টাকা আয় করে?

বাবার এই কথায় হেসে ফেলল ছেলেটি। খুব জ্ঞানীলোকের মতো সে বলল : কৃপণের টাকায় জগতের কোনো উপকার হয় না। মানুষ টাকা আয় করে জীবন ধারণের জন্যে। আর সে মহৎ মানুষ যে টাকা আয় করে সৎকাজে ব্যয় করে।

কৃপণ মানুষটি পুত্রের এই কথা একবাক্যে মেনে নিল। সে স্বীকার করল—এবারে টাকা আয় করে ভালো কাজে সে ব্যয় করবে।

অত্যাচারী বাদশাহ্

এক দেশে এক অত্যাচারী বাদশাহ ছিলেন। বিভিন্ন রকমের অত্যাচার তিনি করতেন। লোকজনের ঘোড়া-গাধা জোর করে কেড়ে নিতেন।

বাদশাহ একদিন সৈন্যসামন্ত সঙ্গে নিয়ে শিকার করতে গেলেন। দলবল নিয়ে শিকার করতে আসা রাজাদের একটা আভিজাত্য। এবং এটা একটা বড় উৎসব। রাজা একা একা একটা শিকারের পেছনে ধাওয়া করতে করতে অনেকদূর চলে গেলেন। তাঁর অন্য কোনোদিকে খেয়াল নেই।

তখন সন্ধ্যা।

রাজা টের পেলেন বনের মাথায় ঘন আঁধার নামছে। সঙ্গে কোনো অনুচর নেই। সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান। তিনি কাছাকাছি এক গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। এক ধনবান ব্যক্তির বাড়িতে রাত্রিযাপন করবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

কিছুক্ষণ পর তিনি দেখলেন, ধনী ব্যক্তিটি তার গাধাকে বেদম প্রহার করছে। গাধা কাতর হয়ে চিৎকার করছে। লোকটি নির্বিকার। সে গাধার একটা পা ভেঙে দিল। রাজা তাই দেখে লোকটিকে বললেন—কী হে, অবলা জীবটাকে এভাবে পিটাচ্ছ কেন? গাধার ঠ্যাং ভেঙে তুমি নিজের শক্তি পরীক্ষা করছ?

লোকটি উত্তেজিতভাবে জবাব দিল : আমার কাজ ভালো কি মন্দ, আমিই সেটা খুব ভালোমতো জানি। গায়ে পড়ে তোমার কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই।

জবাব শুনে বাদশাহ খুব দুঃখ পেলেন।

এইভাবে এই নিরীহ প্রাণীটাকে মারার কী কারণ থাকতে পারে দয়া করে সেটা আমাকে বুঝিয়ে বলবে কি? আমার মনে হচ্ছে, তুমি যে শুধু নির্বোধ তাই নয়, বরং আস্ত একটা পাগল।

লোকটি এ কথায় হেসে বলল : হ্যাঁ, আমি পাগলই বটে। তবে সব শুনলে তুমিও বুঝবে, আমি নির্বোধের মতো গাধাটার পা ভেঙে দিইনি। এর মধ্যে একটা উদ্দেশ্য আছে আমার। আমাদের বাদশাহ খুব অত্যাচারী।

একথা সবাই জানে। আমার এই সুস্থ সবল গাধাটির খবর পেলে নিশ্চয়ই তিনি এটা জোর করে নিয়ে যাবেন। শুনেছি, আমাদের এই এলাকায় বাদশাহ এসেছেন। তাই গাধাটিকে বাদশাহ'র অত্যাচার থেকে রক্ষা করবার জন্যে খোঁড়া করে দিলাম। বাদশাহ গাধাটিকে কেড়ে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে খোঁড়া অবস্থায় এটা আমার কাছে থাকা অনেক ভালো। আমাদের অত্যাচারী বাদশাহকে জানাই শত ধিক!

বাদশাহ গ্রামবাসী লোকটির মুখে তাঁর নিন্দা শুনে খুবই দুঃখ পেলেন। কোনো জবাব দিলেন না। রাগে, অপমানে, দুঃখে সারারাত দুচোখের পাতা এক করতে পারেননি। ঘুমহীন রাত কাটল। ভোরের আলো ফুটল পুব আকাশে। মৃদু বাতাস বয়ে যাচ্ছে। পাখির কলকাকলিতে মুখর চারদিক।

সৈন্যসামন্ত বাদশাহকে খুঁজতে খুঁজতে সাতসকালে হাজির হল সেই গ্রামে। ধনী 'লোকের বাড়ির সামনে এল তারা। শত শত লোকজন এসে মুহূর্তে ভিড় হয়ে গেল। সুসজ্জিত ভৃত্যেরা বাদশাহ'র সেবায় নিয়োজিত হল। সেই বাড়ির সামনে জাঁকজমকপূর্ণ বিশাল দরবার বসে গেল। রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তি রাজার সামনে এসে আসন গ্রহণ করলেন। রাজকীয় খানাপিনার আয়োজন করা হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই এলাকার সম্পূর্ণ পরিবেশ পালটে গেল। সৈন্যদল ও ঘোড়ার পদভারে থরথর করে কাঁপতে লাগল সেই এলাকা।

বাড়ির সেই লোকটি ব্যাপারস্যাপার দেখে একেবারে থ। গতরাতে স্বয়ং বাদশাহ ছিলেন তার অতিথি। অর্থাৎ তার বিপদ ঘনিয়ে এসেছে।

বাদশাহ ডেকে পাঠালেন লোকটিকে।

ধরে-বেঁধে তাকে আনা হল বাদশাহ'র সামনে।

লোকটি বুঝল, তার আত্মরক্ষার আর কোনো উপায় নেই। এই মুহূর্তেই তার জীবন শেষ হবে। আর ভয় করা বৃথা। কারণ উদ্যত তরবারির নিচেই মানবের ভাষা অধিকতর শক্তিশালী হয়ে থাকে।

তাই লোকটি সাহসের সঙ্গে বলল—হে মহামান্য বাদশাহ, আমি একাই শুধু আপনার নিন্দা করি নাই। খবর নিয়ে দেখুন, জনসাধারণ সকলেই একই কথা বলে থাকে। আমাকে সহজেই হত্যা করা আপনার পক্ষে সম্ভব। আমার কথায় আপনি মনে আঘাত পেয়েছেন—সেজন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু আপনার উচিত হবে ভালো কাজ করা—যেন কেউ আপনার বদনাম করতে না-পারে। অন্যায় করে কখনোই সুনাম অর্জন করা সম্ভব নয়। আপনার কর্মচারীরা সারাক্ষণ আপনার গুণকীর্তন করে থাকে। এতে রাজার সম্মান বৃদ্ধি পায় না। প্রজারা যদি বাদশাহ'র সুনাম করে, তাতেই বাদশাহ'র সম্মান বাড়ে।

বাদশাহ এই সাহসী সত্যকথা শুনে দারুণ উদ্দীপ্ত হলেন। লোকটিকে মুক্ত করে দিলেন। সকলের উদ্দেশে বললেন : আমি আজ থেকে চেষ্টা করব ন্যায়পরায়ণ, সুশাসক হতে। আমি চাই একজন ভালো বাদশাহ হতে। যেন আমার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিগন্তরে।

প্রাণীর প্রতি ভালোবাসা

একজন সাধুব্যক্তি পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এখানে ঘোরেন, ওখানে ঘোরেন। লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন। মানুষের উপকার করার চেষ্টা করেন।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন দেখলেন, পথে একটা কুকুর প্রায় মরো-মরো অবস্থায় পড়ে আছে। কুকুরটা পানির পিপাসায় বড়ই কাতর।

কাছেই ছিল একটা পানির কুয়া। কিন্তু সেখানে পানি ওঠানোর কোনোই ব্যবস্থা ছিল না। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে মাথার পাগড়ি খুলে ফেললেন। পাগড়ির সাথে টুপি বেঁধে সেটা নামিয়ে দিলেন কুয়ার মধ্যে। এতে সামান্য একটু পানি উঠল।

ঐ পানি পান করিয়ে তিনি কুকুরটার জীবন রক্ষা করলেন। একজন পথিক তাকে জিজ্ঞেস করল—ভাই, অবলা জীবটির জীবন রক্ষা করার জন্য আপনি নিজের পাগড়ি-টুপি নষ্ট করে ফেললেন।

লোকটি বিনয়ের সঙ্গে জবাব দিল—যার জীবন আছে তার প্রতি আমাদের দয়া দেখানো উচিত। প্রকৃতি-রাজ্যে কত বিচিত্র প্রাণী রয়েছে—সকলের জন্যেই আমাদের ভালোবাসা থাকা প্রয়োজন।

হৃদয় ছাড়া একজন মানুষ কখনই বড় হতে পারে না।

কুকুরের কাজ

বনের ধারে ঘর। সেইখানে থাকে এক বৃদ্ধ। একদিন এক কুকুর সেই লোকটিকে ভীষণভাবে কামড়ে দিল। কুকুরের কামড়ের যন্ত্রণায় সারারাত তিনি ছটফট করতে লাগলেন। ব্যথায় শরীরে জ্বর এসে গেল।

সেই লোকের একটি ছোট মেয়ে ছিল।

সকালবেলা সব শুনে মেয়েটি বাবাকে বলল—কুকুর তোমাকে কামড়েছে? তোমার কি দাঁত নেই? তুমি কেন কুকুরকে কামড়ালে না?

মেয়ের কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠল বাবা।

—কুকুরের চেয়ে আমার গায়ে শক্তি অনেক বেশি। কুকুর আমাকে কামড়েছে, তাই বলে কুকুরকে কামড়ানো আমার শোভা পায় না। ছোটলোকের সঙ্গে কখনও ছোটলোকি করতে নেই। কুকুর কুকুরের কাজ করেছে। আমি তো আর কুকুর নই। আমি কেন কুকুরের কাজ করতে যাব?

দয়ালু বাদশাহ

সিরিয়া দেশের এক বাদশাহ ছিলেন।

খুবই দয়ালু, নীতিবান ও ধর্মভীরু এক বাদশাহ। তিনি প্রজাদের খুব ভালোবাসতেন। প্রায় প্রতিদিন ছদ্মবেশে নগরভ্রমণে বেরোতেন তিনি। লুকিয়ে লুকিয়ে প্রজাদের সুখদুঃখের খবর নিতেন।

একদিন ভোরবেলা।

এক মসজিদের সামনে এসে দেখেন, দুইজন ভিক্ষুক মেঝেতে শুয়ে আছে। নিদারুণ শীতের রাত্রে তারা ভালোমতো ঘুমাতে পারেনি। তাদের না ছিল কম্বল, না ছিল লেপ-তোষক। তাদের একজন অন্যজনকে বলছে—আমাদের দেশের বাদশাহ কতই-না আমোদে-প্রমোদে হাসিখেলায় দিন কাটাচ্ছেন। আমাদের মতো গরিব প্রজাদের খবর কি তিনি রাখেন? আমরা প্রতিদিন কতই-না কষ্ট করছি। রাজা কি তার খবর রাখেন?

আরেকজন বলল—একদিন রাজাকে এইভাবে রাত্রিযাপন করানো উচিত। তাহলে তিনি বুঝতেন, গরিবের কত দুঃখ।

লোক দুজন তারপর বাদশাহকে নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা শুরু করল। ছদ্মবেশে বাদশাহ সব শুনলেন। সমালোচনা একসময় এমন তীব্র হয়ে উঠল যে বাদশাহ আর বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়াতে পারলেন না। তিনি চলে গেলেন।

ক্রমে সকাল হল।

আকাশ রাঙা করে সূর্য উঠল।

মানুষজন জেগে উঠল। শুরু হল সংসারের কাজ। বাদশাহ যথারীতি সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তারপর ডেকে পাঠালেন সেই দুই ভিক্ষুককে। তারা ভয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দরবারে এসে হাজির। বাদশাহ তাদেরকে সিংহাসনের পাশে বসতে বললেন। মূল্যবান খানাপিনা করালেন। টাকাকড়ি ও পোশাক-আশাক উপহার দিলেন।

ভিক্ষুক দুজন তো অবাক!

কোন্ বাদশাহ'র মুখ দেখে আজ ঘুম ভাঙল আমাদের! কোন্ আলো আজ লাগল চোখে। ভিক্ষুক দুজন কাতরভাবে জানতে চাইল—রাজা, হঠাৎ করে আমাদের প্রতি এই অনুগ্রহের কারণ কী?

বাদশাহ হাসতে লাগলেন প্রফুল্ল গোলাপের মতো। বললেন—আমি তেমন বাদশাহ নই যে রাজত্বগৌরবে আমি গর্বিত। আমার প্রজাদের ব্যাপারে আমি উদাসীন নই। সেইজন্যে তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করলাম। আজ থেকে তোমরা আমার বন্ধু। তোমরা গতরাত্রে আমাকে নিয়ে সমালোচনা করছিলে। আমি নাকি দরিদ্র প্রজাদের খোঁজখবর রাখি না।

ভিক্ষুক দুইজন বাদশাহ'র এই কথায় ভারি লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। বাদশাহ'র পায়ে লুটিয়ে পড়ে তারা ক্ষমা প্রার্থনা শুরু করল।

বাদশাহ বললেন—না, ক্ষমা প্রার্থনার কিছু নেই। আমি সিংহাসনে বসেছি প্রজাদের স্বার্থরক্ষার জন্যই। আমিও একজন দাস। আমি শুধু আমার কর্তব্য পালন করেছি। এর বেশিকিছু নয়। আমি তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে পেরেছি—এটাই আমার সান্ত্বনা।

কোমলতার জয়

বাদশাহ'র ভৃত্য পলায়ন করেছে।

রাজা হুকুম দিলেন—যে-কোনোভাবে হোক ওকে খুঁজে বের করো।

ভৃত্যকে খুঁজে ধরে নিয়ে আসা হল।

বাদশাহ তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

নিয়ে যাওয়া হল তাকে জল্লাদের দরবারে। জল্লাদের খড়্গ উদ্যত। এই ঘোর দুঃসময়ে একজন মানুষের করার কী থাকতে পারে! ভৃত্যটি হতাশার ঘন অন্ধকারে নিমজ্জিত। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে বেচারা কাতরস্বরে প্রার্থনা শুরু করল : হে পরম করুণাময়, আমাকে অহেতুক হত্যা করা হচ্ছে। যারা আমাকে হত্যা করছে তাদের আমি ক্ষমা করেছি। তুমিও তাদের ক্ষমা করো। বাদশাহ আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই। কারণ এই রাজাই আমাকে প্রতিপালন করেছেন। তুমি সকলের পাপ ক্ষমা করো।

বাদশাহ ভৃত্যের ফাঁসির মঞ্চের পাশেই ছিলেন। ভৃত্যের মৃত্যুকালীন প্রার্থনা শুনে তাঁর চিত্ত বিচলিত হল। তিনি লজ্জা পেলেন। তাঁর সমস্ত রাগ পানি হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন রাজা : ওকে মুক্ত করে দাও।

ভৃত্যটি মুক্তি পেল তার কোমলতা দিয়ে।

যদি ফাঁসির মঞ্চে তার ক্রোধের আগুন জ্বলত, তবে হিতে বিপরীত হতে পারত। ভৃত্যটি প্রার্থনার সময় নম্রভাবে, কোমলভাবে, বিনীতভাবে সকলের মঙ্গল কামনা করেছে। মনে রাখা দরকার, সকলের মঙ্গল কামনার মধ্যেই নিজের মঙ্গল লুকিয়ে থাকে।

চিল আর শকুন

আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল চিল আর শকুন।

অসীম-অনন্ত নীল আকাশ। মেঘমুক্ত নির্মল পরিবেশ।

শকুন তার বন্ধু চিলকে বলল—ওহে চিল, আমি কত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন তুমি কি তা জানো? তুমি কি জানো, এত উপর থেকেও আমি নিচের সবকিছু দেখতে পাই?

চিল বলল—হয়তো তোমার কথা সত্যি। কিন্তু ভাই, কথার কোনো মূল্য নেই। তুমি দূরের জিনিস কেমন দেখতে পাও, এসো তার একটা পরীক্ষা হয়ে যাক।

শকুন এককথায় রাজি।

উড়ে উড়ে তারা এল বহুদূরের এক জঙ্গলের মাথায়। চিল জানতে চাইল —নিচে কী আছে তুমি কি তা সব দেখতে পাচ্ছ?

শকুন গভীর দৃষ্টি দিয়ে নিচে তাকাল।

—ভাই, তুমি যদি বিশ্বাস করো, তবে শোনো—বনের পাশে ঠিক ঐ স্থানটিতে একটা গমের দানা আছে, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

চিল এই কথায় বিস্মিত হল। সে তো কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। এবং বিশ্বাসই করতে পারল না, এতদূর থেকে একটা গমের দানা দেখা সম্ভব।

শকুন বলল—শুরু হোক আমাদের পরীক্ষা।

তখন চিল আর শকুন দুজনেই উড়ে উড়ে নিচের দিকে নামতে লাগল। শকুন বিজয়গর্বে উৎফুল্ল। কারণ আরেকটু নামলেই সত্যি সত্যি সে গমের দানাটা সংগ্রহ করতে পারবে। যখনই সে গমটা আনতে গেছে তৎক্ষণাৎ তার পায়ে শিকারির ফাঁদ আটকে গেল। শকুন টের পেল—তার আর মুক্তি নেই। অনেকক্ষণ চেষ্টা করল। কিন্তু যতই চেষ্টা করে ততই কঠিন বন্ধনে বেচারা আটকে যাচ্ছে।

বোঝা গেল, শকুনের ভাগ্যে আর মুক্তি নেই। এই ঘটনায় চিল অতিশয় দুঃখিত হল। সে বলল—কী আশ্চর্য ব্যাপার, অতদূর থেকে তুমি সামান্য গমটি দেখতে পেলে, আর এত নিকটে এসে বড় ফাঁদের বন্ধন তোমার

চোখে পড়ল না। তোমার দূরদৃষ্টির পরিণাম বড় ভয়াবহ। এই বিপদের সময় দূরদৃষ্টি দিয়ে তোমার তো কোনো উপকার হল না।

শকুন আর কিছুই বলল না।

—এখন আমি মৃত্যুপথযাত্রী। আমার এখন সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনা নেই। অনন্ত সাগরে কূল নেই, কিনারা নেই—সেখানে সাঁতারের বাহাদুরি দেখানোর কোনো মানে নেই।

এখন আমি নিদারুণ বিপদে পড়েছি। এই সময় আমার দূরদৃষ্টির কোনো অর্থ হয় না।

সকলেই পরাধীন

মরুভূমির পথ ধরে চলেছে দীর্ঘ উটের কাফেলা। সারি সারি ছোট-বড় উট। দীর্ঘ অফুরন্ত রাস্তা ধরে তারা চলেছে।

ক্লান্ত উটের দল পথে বিশ্রাম নিতে বসল। তখন এক উটের বাচ্চা তার মাকে হতাশ স্বরে বলল—মা, আমার হাতে যদি লাগাম থাকত, আমি কখনই এই কাফেলার সঙ্গে এইভাবে বোঝা বহন করতাম না। হায়, আমার কী দুর্ভাগ্য! আমার কোনো স্বাধীনতা নেই। আমার পথ চলার পরিচালক অন্য একজন।

উটের মা তখন জবাব দিল—হায়রে অবোধ শিশু। পরাধীন তুমি একা নও। সকলেই আসলে পরাধীন। মানুষেরও কোনো স্বাধীনতা নেই। তাকেও একদিন মৃত্যুবরণ করতে হয়। একজীবনে তাকেও অনেক বিপদের মুখোমুখি হতে হয়।

সব বিপদ থেকে সে কি নিজেকে উদ্ধার করতে পারে? যখন মাঝসমুদ্রে ঝড়ের কবলে জাহাজ আক্রান্ত হয় তখন সুদক্ষ নাবিকও কিছু করতে পারে না। তার আর্তচিৎকারধ্বনি আকাশে মিলিয়ে যায়।

উটের মা তার শিশুকে আদর করতে করতে বলল—আমরা অন্তত বনের নির্বোধ পশুপাখির চেয়ে অনেক ভালো আছি। আমরা কাজ জানি। মানুষ তাই আমাদের ভালোবাসে।

গোপন কথা

এক বাদশাহ তাঁর অত্যন্ত প্রিয় কর্মচারীকে একটি গোপন কথা বললেন। সাবধান করে দিলেন বারবার, যেন এই কথা কেউ জানতে না-পারে।

কথা গোপন রাখা খুব কঠিন কাজ। অনেকেই সেটা পারে না।

প্রায় বছরখানেক কথাটা গোপন থাকল। তারপর একদিন রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল সেই গোপন কথা। হাটে-মাঠে-ঘাটে সবখানে সবাই জানে সেটা।

বাদশাহ তখন ডেকে পাঠালেন তার প্রিয় কর্মচারীকে। এবং তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

কেন এই কথাটি প্রকাশিত হল?

কর্মচারীটিকে নিয়ে যাওয়া হল জল্লাদের কাছে। তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে।

কর্মচারীটি তখন কাতর অনুনয় করে বলল,

—বাদশাহ, আমাকে ক্ষমা করুন। এই অপরাধের জন্য আমি দায়ী। কিন্তু এক অর্থে আপনিও দায়ী। আপনি নিজের কথা নিজেই গোপন রাখতে পারেননি। আমার মতো সামান্য একজন কর্মচারী কীভাবে সেটা গোপন রাখবে? আর আপনি সেটা আশাই-বা করেন কীভাবে? সমুদ্রের জল বন্ধ করতে না-পারলে নদীর প্রবাহ কি বন্ধ করা সম্ভব?

বাদশাহ তার প্রিয় কর্মচারীর কথা মেনে নিলেন।

মুক্তি দেয়া হল কর্মচারীটিকে।

বুদ্ধিমান মন্ত্রী

এই গল্পটি ইরান দেশের।

সেখানকার এক বাদশাহ, নাম তার ফরিদ। বাদশাহ'র ছিল অতি বিচক্ষণ এক মন্ত্রী। খুবই জ্ঞানী লোক। তার দূরদর্শিতা ছিল অসাধারণ। বাদশাহ তাকে ভালোও বাসতেন খুব। রাজ্যের যে-কোনো বিপদ-আপদে এই মন্ত্রী সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন।

একদিন এক ব্যক্তি বাদশাহ'র কাছে গিয়ে গোপনে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল।

—হুজুর, আপনার প্রিয় এই মন্ত্রী ভিতরে ভিতরে আপনার শত্রু। তিনি বহুলোককে রাজকোষ থেকে টাকা ধার দিয়েছেন। শর্ত একটাই—আপনার মৃত্যুর পরে এই টাকা শোধ দিতে হবে। তিনি চান না যে আপনি দীর্ঘজীবী হোন। আপনার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার হাতে অনেক অনেক টাকাপয়সা আসবে। কী ভয়ংকর চক্রান্ত—বাদশাহ আপনি একবার ভেবে দেখুন।

বাদশাহ এই কথা শুনে মন্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হলেন। সময়মতো একদিন তিনি তাকে বললেন—

মন্ত্রী, এ কী কথা শুনতে পাচ্ছি? লোকজনদের টাকা ধার দিচ্ছেন অন্যরকম শর্তে, এর উদ্দেশ্য কী? আমি বেঁচে থাকতে আপনি এই টাকা ফেরত নেবেন না, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আমার মৃত্যুতেই আপনার যথেষ্ট লাভ। আপনাকে আমি আমার আন্তরিক বন্ধু বলেই জানি। কিন্তু আপনার এ কেমন শত্রুর মতো আচরণ?

মন্ত্রী তখন বাদশাহ'র সামনে আভূমি কুর্নিশ করল।

—জাঁহাপনা, আপনি যখন জিজ্ঞেস করলেন তখন আপনাকে সব কথা পরিষ্কারভাবে বলা উচিত। কিছুই গোপন করা উচিত নয়। আমি চাই সমস্ত লোকই আপনার মঙ্গল কামনা করুক। কিন্তু যারা আপনার শত্রুপক্ষ, আপনার বিরুদ্ধে কথা বলে, আমি শুধু তাদেরকেই শর্তসাপেক্ষে টাকা দিয়েছি। শর্তটি হচ্ছে—আপনার মৃত্যু না-হলে টাকা ফেরত দিতে হবে না।

জাঁহাপনা, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, টাকা ধার নিয়ে সহজে সেটা কেউ ফেরত দিতে চায় না। সুতরাং আপনার বিরুদ্ধপক্ষ সারাক্ষণই কামনা করবে—যাতে আপনার মৃত্যু না-হয়। যাতে আপনি সুদীর্ঘ জীবন লাভ করতে পারেন। টাকার মমতাতেই তারা আপনার পূর্ণ স্বাস্থ্য ও সুদীর্ঘ জীবন কামনা করবে।

বাদশাহ উত্তর শুনে খুবই সন্তুষ্ট হলেন। মন্ত্রীর বুদ্ধির তারিফ করতে লাগলেন। তাকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করলেন। আর মন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে-লোকটা বদনাম করেছে তাকে শাস্তি দিতেও ভুললেন না।

ভালোমানুষ

বাদশাহ একদিন দারুণ খুশি।

রাত্রে একটি চমৎকার স্বপ্ন দেখেছেন। তার আজ মন খুব ভালো। সকালেই তিনি এক ভৃত্যের হাতে এক থলে মোহর দিয়ে বললেন—যাও, এই শহরে যত নিঃস্ব ও ভালোমানুষ আছে সবাইকে এই অর্থ দান করে এসো।

ভৃত্যটি টাকার থলে হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল। সারাদিন ঘুরে সন্ধ্যার সময় ফিরে এল ভৃত্যটি। মোহরের থলে বাদশাহকে ফেরত দিল।

বাদশাহ অবাক হলেন।—এই শহরে এত নিঃস্ব লোক রয়েছে, তুমি কি তাদের একজনকেও খুঁজে পেলে না? তুমি আবার ভালো করে অনুসন্ধান করো। তারপর মোহরগুলো দিয়ে এসো।

ভৃত্যটি বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিল—জাঁহাপনা, আমার সঙ্গে সবার দেখা হয়েছে। যারা প্রকৃত ভালোমানুষ তারা বিনয়ের সঙ্গে দান প্রত্যাখ্যান করেছে। আর যারা প্রকৃত ভালোমানুষ নয়, তারা লোভীর মতো হাত বাড়িয়েছে। আপনি নিঃস্ব ও ভালোমানুষদের টাকা দিতে বলেছেন। তারা টাকা গ্রহণ না-করায় আমি সমস্ত মোহর ফেরত নিয়ে এসেছি।

বাদশাহ খুব খুশি হলেন।—তুমি ঠিক কাজটিই করেছ। সকলেই যে প্রকৃত সাধু ব্যক্তি নয়, একথাটি আমি বুঝতে পারি নাই। তোমার কর্তব্যজ্ঞান আমাকে মুগ্ধ করেছে।

যে ব্যক্তির মন থেকে টাকাপয়সার লোভ দূর হয়নি—সে কখনও সাধু ব্যক্তি হতে পারে না।

নিজে ভালো

সিকান্দার শাহ ছিলেন রোমের বাদশাহ। দিগ্বিজয়ী, পরাক্রান্ত, সৎ ও নিপুণ যোদ্ধা ছিলেন তিনি। পৃথিবীর বহু দেশ জয় করেছিলেন। প্রজারা তাঁকে দারুণ শ্রদ্ধা করত।

একবার কয়েকজন লোক সিকান্দার শাহকে জিজ্ঞেস করলেন,

—আপনি একজন বিশ্ববিজয়ী বীর। আপনার আগেও অনেক বাদশাহ ছিলেন রোমে। তাদেরও সৈন্যদল ছিল। তারাও যুদ্ধ করতেন। কিন্তু তারা আপনার মতো এমন সুনাম অর্জন করেননি। তারা আপনার মতো এত দেশ দখল করতে পারেননি। এর কারণ কী?

সিকান্দার শাহ প্রশ্ন শুনে মৃদু হাসলেন।

—আমি পৃথিবী জয় করেছি ভালোবেসে। সকলকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছি। কাউকে আমি কোনো কষ্ট দিইনি। তাই প্রজারাও আমাকে ভালোবেসেছে। আমি কারও বদনাম করিনি। শত্রুদের সঙ্গে আমি সবসময় ভালো ব্যবহার করেছি। আইনকানুন মেনে চলেছি। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দিয়েছি।

সকলের উদ্দেশে সিকান্দার বললে : নিজে ভালো হলে পৃথিবীও ভালো। এবং ভালো লোকদের সবাই ভালোবাসে।

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়

বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ

ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে

পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই বইটি 'চিরায়ত গ্রন্থমালা'র

অন্তর্ভুক্ত।

বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।